ধারাবাহিক রচনা

মহীয়সী জননী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[প্রয়াত প্রথিতযশা লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলিরই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলিতে। প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে-যাওয়া সমাজের সামনে আলোকবর্তিকার মতো তুলে ধরা হয়েছে সনাতন ভারতের স্বরূপ। সত্যের আধারে কাহিনিগুলি পরিবেশিত হলেও সাহিত্যিকের সরস উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অশীতিপর সাহিত্যিকের এই মর্মস্পর্শী রচনাগুলিতে। নিজের মাকে নিয়ে এই রচনাটির এবার তৃতীয় কিস্তি।—সঃ]

গল্প বলতেন মা। প্রতিবেশী মেয়েরা মায়ের কাছে গল্প শুনতে আসত। প্রায় সন্ধ্যায় ওপরের বারান্দায় আসর বসত মায়ের। শরৎচন্দ্রের কাহিনির টান ছিল সব থেকে বেশি। কখনও নন্দকুমারের ফাঁসি, কখনও বা বিলিতি গুপ্তকথা। আরব্যরজনীর গল্পগুলো মা বেশ জমিয়ে বলতে পারতেন। কত বিচিত্র ধরনের গল্প, সারা দুনিয়া জুড়ে তার ব্যাপ্তি, কত প্যাঁচ-পয়জার।

'দারুয়া ময়দানে' তাজিয়া জড়ো হত, মুসলমানেরা বুক চাপড়ে 'হাসান হোসেন' ধ্বনি তুলত—তাঁর বালিকাবয়সে দেখা সেসব দৃশ্যের অর্থ বুঝতে পারতেন না মা। পরবর্তী জীবনে মীর মোশারফ হোসেন সাহেবের লেখা 'বিষাদসিন্ধু' বইখানি তাঁর হাতে এসে পড়ে। তিনি বুঝতে পারেন মুসলমানদের বুক চাপড়ে এই হাহাকার ধ্বনির অর্থ কী! তার শুরুটি এইরকম—

ইসলাম ধর্মগুরু হজরত মহম্মদ বড় ভালবাসতেন তাঁর দুই দৌহিত্রকে। একজনের নাম হোসেন, অন্যজনের নাম হাসান। একদিন হজরত মহম্মদ দুই দৌহিত্রকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন—বলো আমার কাছে তোমরা কী চাও?

হাসান সবুজ রঙের আর হোসেন লাল রঙের একটি করে 'বসন' প্রার্থনা করলেন। স্বর্গের দূত মহম্মদের কাছে নেমে এসে বললেন—এই মুহূর্তে নির্ধারিত হয়ে গেল ওদের ভাগ্য। একজন বিষপানে নীল হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অন্যজন খঞ্জরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

তাই হল। অনেক বিষাদময় ঘটনার আবর্তে পরিণতি হল ঠিক তাই।

মায়ের বর্ণনা শুনে আমরা চোখের জল রোধ করতে পারতাম না। তেমনি আর একখানা বই—অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'রাজকাহিনী'। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, বলার কৌশলে অবনীন্দ্রনাথ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁর ছবি কথা বলে

আর লেখা যেন ছবি এঁকে এঁকে চলে। মায়ের মুখে সেইসব কাহিনি এক আশ্চর্য মাত্রা পেত। গোহ, শিলাদিত্য, বাপ্পাদিত্যের কাহিনি শুনতে শুনতে এমনই মোহাচ্ছন্ন হয়ে যেতাম যে কথককে প্রশ্ন করতে ভুলে যেতাম।

তখন চলেছে বিলিতি লবণ বর্জনের অভিযান। আমাদের দেশে রয়েছে লবণাম্বুরাশি। বিলিতি লবণ বর্জন করে সমুদ্রজল থেকে তৈরি করতে হবে লবণ। আমাদের বাড়ি খেজুরি অঞ্চলে। এখানে থইথই করছে বঙ্গোপসাগরের জল। মা চলেছেন ছোট ছেলেটির হাত ধরে। নুনমাটি চেঁছে তুলে তৈরি করতে হবে নুন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে চলছে আইন অমান্য আন্দোলন।

এই অঞ্চলটিকে বলা হত নিমক মহল। বহুকাল থেকে চলে আসছে এই নিমক তৈরির ব্যবসা। খেজুরি থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত প্রসারিত এই নিমক মহলের কর্মকাণ্ড। ইংরেজরা মুনাফা লুটত জমিদারদের সহযোগিতায়। নিষ্পেষিত হত সাধারণ মলঙ্গীরা (লবণ তৈরি করে যে-শ্রমিক)।

নুন তৈরির একটা পদ্ধতি আছে এ-অঞ্চলে। সাড়ে চারফুট উঁচু আর সাড়ে সাতফুট মতো চওড়া একটা গোলাকার মাটির দেওয়াল তৈরি করা হয়। একটা বড় মাপের গামলা বসানো হয় ভেতরে। তার মাঝ বরাবর একটা ছোট ছিদ্র। তার নিচে থাকে মাটির তৈরি 'কুন্‌রি'। কুন্‌রির নিচে বসানো হয় 'মইদা' বা ছাঁকনি। ছাঁকনির তলায় বেশ বড় একটা পাত্র—'নাদ'—এত বড় যে ওর ভেতর তিরিশ ঘড়া মতো জল ধরে রাখা যায়। মইদা থেকে ঝরে পড়া পরিশ্রুত লবণজল নিচের নাদটিতে জমা হয়। প্রায় একদিন নাদের ভেতর জল থিতোতে থাকে। এরপর ছোট ছোট হাঁড়িতে সে-জল ভরে ফোটানোর ব্যবস্থা হয়।

এই নুনজল ফোটানোর ঘরকে বলে 'কাঁটচক্কর'। এক-একটি চুলার ওপর চারশো মতো নুনজলের ঘড়া সাজানো হয়। ঘণ্টা চারেক জল ফোটানোর কাজ চলে। এরপর হাঁড়ি থেকে ধবধবে সাদা নুন পাওয়া যায়।

সেদিন আমার হাত ধরে মা চলেছেন নদীর ধারে নুন তৈরি করতে। দলে দলে চলেছেন মহিলারা। পিছনে ছেলের দল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছে চরাচর। গান্ধীটুপি মাথায় নেতারা পরিচালনা করে নিয়ে চলেছেন। নুনমাটি চেঁছে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

এমন সময় দলে দলে পুলিশ এসে হাজির অকুস্থলে। বেধড়ক লাঠি চলল ভলান্‌টিয়ারদের ওপর। নারীপুরুষ ভেদ নেই। মাথা ফাটল, রক্ত ঝরল। একটি পুলিশ লাঠি উঁচিয়েছিল মায়ের মাথায়। কিন্তু একটি শিশু তাঁকে জড়িয়ে বসে আছে দেখে তার বিবেকে বাধল। সে চলে গেল নুনজলের হাঁড়িকুঁড়িগুলো ভাঙতে। কতক্ষণ পরে চাঁদ উঠল। মাঠের পথ ধরে সারি দিয়ে ফিরছিল সবাই। আমি কখনও মায়ের হাত ধরে, কখনও বা কোলে চেপে ফিরছিলাম গাঁয়ের দিকে। হঠাৎ শুনতে পেলাম শত শত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। সাহসী অভিযাত্রীদের বরণ করে নিচ্ছে গ্রামবাসীরা। মঙ্গলশঙ্খধ্বনির মাঝখানে মায়ের সঙ্গে আমি গৃহপ্রবেশ করলাম।

মায়ের স্বভাবের প্রভাব আমার চরিত্রে বিশেষভাবে সঞ্চারিত। একটি উদাহরণ দেব।

আমাদের কলাগেছিয়া গ্রামটি সেকালে ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ। বিদ্যাচর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল এটি। এই গ্রামের এক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (যেখানে ছাত্রদের কেবল দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত) আমার শৈশবশিক্ষার শুরু। আমার পাঠশালার বন্ধুদের ভেতর একজনকে আমি ভুলতে পারিনি আজও। আমাদের পাশের গ্রাম বাহারগঞ্জ থেকে সে আসত আমাদের পাঠশালায়। অতি দরিদ্র

সহায়সম্বলহীন মুসলমান বাড়ির ছেলে সে। বিধবা মায়ের একটি মেয়ে আর একটি ছেলে। পড়শিদের বাড়ি ধান ভেনে, বাসন মেজে কোনওরকমে তাঁর দিনগুজরান হত। জমিদারবাড়ির বিনিপয়সার পাঠশালা, তাই দুখিনী মা ছোট ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলেন।

আমি মিয়াসাহেবের সঙ্গে ছোট একখানা বেঞ্চে পাশাপাশি বসতাম। দুপুরবেলা টিফিনের ছুটি হলে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়তাম। জঙ্গলে বৈঁচি কুল তুলে খেতাম। পেয়ারা পেলে অর্ধেক ভাগ হত দুজনের। খানিকটা ও দাঁতে কেটে খেত তারপর আমি খেতাম। জাতপাতের বিচার তখনও ঢোকেনি মাথায়। মার কাছে এসে গল্প করতাম। মা বলতেন—একদিন আনবি তো ছেলেটাকে।

জ্বরে পড়েছিলাম তাই পাঠশালায় যেতে পারিনি কদিন। বন্ধুর খোঁজে একদিন মিয়াসাহেব এসে হাজির আমার বাড়ি। ছিন্নমলিন একখানা ট্যানা পরনে। মেজদাদু আলাদা থাকতেন। তাঁর পাহারাদার গেট দিয়ে ঢুকতে দেয়নি ছেলেটিকে। ওপর থেকে দেখতে পেলেন আমার মা। শুনেছিলেন আমার মুখে তার বর্ণনা। নিচে নেমে এসে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেলেন তাকে।

বন্ধুর বাড়ি খালি হাতে আসেনি সে। নিয়ে এসেছিল ছোট ছোট দুটি মুরগির ডিম। হালকা গোলাপি আভা। বন্ধুপ্রীতির রঙে রঙিন।

মাছ ধরা হচ্ছিল খিড়কিপুকুরে। মা সেরখানেক একটা পোনা মাছ খড়ে জড়িয়ে আমার বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন—খেয়ো তোমরা। অসুখের বাড়ি তাই বসিয়ে খাওয়ালাম না।

কিন্তু আর একদিন এল যখন, দুই বন্ধু মায়ের কাছে বসে খেয়েছিলাম।

একযুগ পেরিয়ে গেছে তখন। কলকাতা থেকে দেশে গেছি। হিন্দু-মুসলমানের রায়ট শুরু হয়ে গেছে। মা অক্ষত অবস্থায় আমাকে দেখে আনন্দে বিহ্বল। ওপরের বারান্দায় বসে আছি, মা জলখাবার আনতে নিচে গেছেন। কানে এল মায়ের গলা—আজ আর না, পুকুরে হাত-পা ধুয়ে চলে এসো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে জোড়া পায়ের সাড়া পেলাম। তাকিয়ে দেখি বারান্দা পেরিয়ে মা আসছেন, হাতে জলের জাগ। পেছনে আর একজন আসছে, তার হাতে একখানা ধামা।

কাছে এলে আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। স্বাস্থ্যবান এক যুবক, কালো চাপদাড়িতে তখন মিয়াসাহেব বাদশা আলমগীর।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ওর ধামায় ছিল একধামা মুড়ি। মা এনেছিলেন কৌটোয় ভরে নারকেল নাড়ু।

ধামা থেকে মুড়ি তুলে তুলে খেলাম দুজনে। মা নিচের থেকে আলু-পেঁয়াজ ভেজে এনে দিলেন। মিয়াসাহেব আমাদের সবজিবাগান তৈরি করতে এসেছিল। শুনলাম, তার মা মারা গেছেন। দিদি বিয়ে করে চলে গেছে সুন্দরবনের দিকে কোথায় যেন। রাতে একখানা বড় কাঁসার থালায় দুজনে একসঙ্গে বসে মায়ের রান্না করা খাবার খেলাম। আমার গোঁড়া মেজো ঠাকুরদা নিচের প্রস্থে থাকতেন। তিনি কিছুই জানতে পারলেন না।

চাঁদের আলোয় বন্ধুকে সেদিন অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। পরে একসময় শুনেছিলাম, মিয়াসাহেব বিয়ে করে তার দিদির কাছে চলে গেছে সুন্দরবনে।

আমার কলকাতার বাড়িতে রঙের কাজ হলে একদল মুসলমান মিস্ত্রি আসত কাজ করতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ক্যানিং অথবা ডায়মন্ডহারবার লাইনের কোনও অঞ্চল থেকে। ট্রেনে চেপে আসে তারা, সকাল আটটায় কাজের জায়গায় হাজির। হাতমুখ ধুয়ে লুঙ্গি ছেড়ে পরত সাদা রঙের হাঁটু

অবধি ঝোলা একটি অ্যাপ্রন। মাথায় সাদা ফেজ। এই অবস্থায় ভারার ওপর উঠত তারা।

নিচে রং গুলত বছর পঁয়ষট্টির হেডমিস্ত্রি। কৌটোয় কৌটোয় রংগুলো সে দড়ির সাহায্যে পাঠিয়ে দিত প্রতিটি মিস্ত্রির কাছে। হাতের আঙুলগুলোকে গোল করে দূরবিনের কায়দায় তাকাত ওপরদিকে। কারও কাজ সঠিক না হলে ধমক লাগাত। লোকটির নাম আবিদ আলি। সার্থকনামা ছিল সে। আবিদের অর্থ, 'অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ'। পয়সা নিয়ে কাজ করব আবার বেইমানি করব—এ হতে দেবে না সে।

আবিদ দরজা-জানলা রং করত নিজের হাতে। সি-গ্রিন রঙের দরজা, জানলার পাল্লাগুলো সে সিরিস ঘষে আগে পরিষ্কার করত, তারপর রঙের কাজ। জানলার গ্রিলগুলো মাজত লোহাঘষা সিরিস মেরে। গ্রিলের ধবধবে সাদা রঙের একফোঁটাও ছিটকে পড়ত না দরজা-জানলার পাল্লায়। এমন নিবিষ্ট হয়ে কাজ করত সে যে, ডাকলে সহজে সাড়া পাওয়া যেত না। বেলা পড়ে এলে মানুষটি মুখহাত ধুয়ে উঠে যেত আমার তিনতলার হলঘরে। দরজা খুলে দিয়ে তাকাত পশ্চিম আকাশের দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে রীতি মেনে নমাজ পড়ত। শ্রীমতী তার প্রার্থনার জায়গায় একটি কাশ্মীরি কার্পেট পেতে রাখতেন। এক রমজানের মাসে সেই বৃদ্ধ ভক্ত মানুষটিকে দিনান্তে খাইয়েছিলেন শ্রীমতী।

একসাজ কাঁসার বাসন কেনা হয়েছিল। সেই বাসনে ভক্ত মানুষটিকে অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খেতে খেতে জল এসে গিয়েছিল বৃদ্ধের চোখে। সে এতখানি সমাদর আশা করেনি। বলেছিলাম—আমার বাবা বেঁচে থাকলে তোমার বয়সি হতেন। আমার যখন একবছর বয়স তখন বাবা মারা গেছেন। তোমাকে সেই আসনে বসিয়ে আজ বড় তৃপ্তি পেলাম।

আবিদ আর আসেনি। শুনেছিলাম, তার ইন্তেকাল হয়েছে। তার জলখাওয়া কাঁসার গ্লাসটি অনেকদিন আমি ব্যবহার করেছি।

মনে মনে ভাবি, এ কি আমার মুক্তমনা মায়ের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার! ✠

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হয়েছে

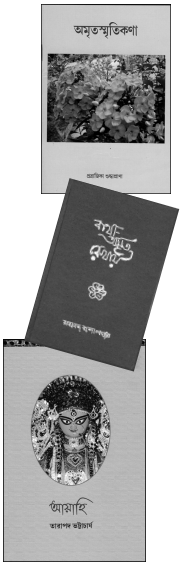

অমৃতস্মৃতিকণা ● প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা

শ্রীসারদা মঠের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণামাতাজী আশৈশব রামকৃষ্ণ মঠের বহু প্রণম্য সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান। তাঁর দুর্লভ স্মৃতির এই সুখপাঠ্য সংগ্রহ এক অসাধারণ পুস্তিকা। মূল্য ১৫ টাকা।

কথা-অমৃত রেখায় ● রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা কথামৃতের পঁচিশটি উপদেশে ঋদ্ধ পুস্তক। আর্ট পেপারে সাদা-কালোয় স্কেচ, প্রতিটি ছবিই শিল্পীর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ। মূল্য ৮০ টাকা।

আয়াহি ● তারাপদ ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজার প্রাক্‌লগ্নে দেবীর পুণ্য আগমনীর বার্তা বহন করে আনে শরতের প্রকৃতি। মানুষের মনেও দেবীর তত্ত্ব জানার, তাঁর লীলাকথা শোনার আগ্রহ জাগে। সে আগ্রহ পূরণ করেছেন স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য। মূল্য ৪০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন কার্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, অদ্বৈত আশ্রম।